গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

(Abstract)

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

(Abstract)

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্য সমাজের নবজাগরণের মূলে আছে 'ইউরোপ'। চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ইতালিতে সূচনা হয়ে পরবর্তীকালে জার্মানিতে রিফরমেশন ও ফরাসি বিপ্লব হয়ে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব সংঘটিত করে, যা ইউরোপীয় উপনিবেশবাদে মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। এই সময় ইউরোপ বিভিন্ন মহাদেশের উপর আধিপত্য বিস্তারে মনোযোগী হয়, বিশেষ করে এশিয়া ভূখণ্ডের জাতিগণের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতির সম্বন্ধে জ্ঞান আরোহণ করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই 'এশিয়াটিক সোসাইটি'(১৭৮৪) 'ইউরোপীয় কাউন্টার পার্ট' হিসাবে প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীকালে 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' (১৮০০), 'হিন্দু কলেজ' (১৮১৭) প্রতিষ্ঠা ও ডিরোজিও–র মতো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব বঙ্গসংস্কৃতিকে পাশ্চাত্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের রক্ত সঞ্চার করেছিল। এতদিনের মধ্যযুগীয় জন্মপ্রদত্ত গণ্ডি অতিক্রম করে বঙ্গীয় তরুণ জাতকেরা সেদিন হতে চেয়েছিল বিশ্বসংস্কৃতির যাত্রী, মুক্তপথের পথিক। এইভাবে উনিশ শতকে বাংলার সাহিত্য ও সমাজে, কর্মে ও মননে বাঙালি যে অজস্র চরিতার্থতায় নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছিল তার মূল কারণ ছিল ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলন। বাংলা কথাসাহিত্যে বিভিন্ন লেখকের লেখায় প্রত্যক্ষভাবে ইউরোপ কীভাবে এসেছে তা দেখানোই আমাদের গবেষণার অভিপ্রায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইউরোপ মহাদেশের ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির সঙ্গে বাঙালির যেভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আর অন্যত্র সেভাবে নয়। তাই আমরা আমাদের গবেষণা কর্মে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখেছি।

প্রথম অধ্যায়:
ঔপনিবেশিক কালপট

বাঙালির সঙ্গে ইউরোপীয় সংযোগ সাধন।

উনিশ শতকে আয়া বা গৃহভৃত্যের তুলনায় ভারতীয়দের মধ্যে অনেক বেশি লোক জাহাজের খালাসি, সারেং, লস্কর বা নাবিক হয়ে ইউরোপে যেতেন। লস্করদের জাহাজে নাবিকের কাজ করে বিলেত যাওয়ার কাজও খুব সহজ ছিল না। তাদের ওপর জাহাজের মালিকেরা নানা রকম অত্যাচার করতেন, এমনকি জানতে পারা যায় কোনও কোনও জাহাজের ক্যাপ্টেন লস্করদের মেরে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিতেন। এর পরেও লস্কররা অনেকটা জেনে বুঝে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই ইউরোপে পাড়ি দিতেন। এই সময়ের দলিল দস্তাবেজ থেকে জানা যায় চাষি এবং সাধারণ শ্রমিকের তুলনায় লস্করের কাজে অর্থ উপার্জন ছিল অনেকটাই বেশি। বিলাত তথা ইউরোপে পৌঁছানোর পরও লস্করদের জীবন যে, খুব আরামদায়ক ছিল তা নয়- তা আমরা বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ থেকে জানতে পারি। তাঁরাও আয়া বা ভৃত্যের মতোই অনেক কষ্টে তাঁদের জীবন যাপন করতেন। উল্লেখ্য, সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক পর্যন্ত যে সমস্ত ভ্রমণকারীরা ইউরোপে গেছেন তাঁদের প্রায় সকলেই ‘মুসলিম’ সম্প্রদায়ের মানুষ। কারণ আমরা দেখেছি বাঙালিদের মধ্যে মুসলমান সমাজের বিধিনিষেধ তেমন শক্ত ছিল না।

এই সময়ই মনোভাবের পরিবর্তনের কারণ হল এসময় কলকাতা নগরীতে হিন্দু কলেজসহ একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয়। তাঁরা স্পষ্ট বুঝতে পারে— চাকরি, ব্যাবসা-বাণিজ্য, সম্পত্তি রক্ষা, ধনশালী হওয়া সহ একাধিক ইহলৌকিক নানা সুবিধা পেতে ইংরেজদের সংস্পর্শে আসতেই হবে। এ প্রসঙ্গে দুই প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তি রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ বলা যেতে পারে। তাঁরা ইংরেজি শিক্ষার ইহলৌকিক সুবিধা ছাড়াও বাঙালি সভ্যতা ও সংস্কৃতির দীর্ঘদিনের কূপমণ্ডূকতা দ্বারা আচ্ছন্ন বাঙালি প্রজন্মকে উনিশ শতকে নতুন আলোর দিশা দেখাতে চেয়েছিলেন। ফলত এই জাগ্রত চিন্তা-চেতনার দ্বারা লালিত হয়েই পরবর্তীকালে একাধিক মুক্তমনা মানুষ সাতসমুদ্রের কালাপানি

পার হয়ে ইউরোপ ভ্রমণের শুধু স্বপ্নই দেখেন তা নয়, জীবনের ঝুঁকি নিয়েই ভ্রমণ করেন ও পরদেশে জীবন অতিবাহিত করেন। এরকমই দুজন বাঙালি ব্যক্তি হলেন রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর।

দ্বিতীয় অধ্যায়:
বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবী
বাংলা কথাসাহিত্যে ইউরোপীয় হাতছানি

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র রচনাকাল ১৮৬২ সাল এবং শেষ তথা চতুর্দশতম উপন্যাস 'সীতারাম' এর প্রকাশ ১৮৮৭ সাল, অর্থাৎ বঙ্কিমের উপন্যাস রচনার সময়কাল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। কিন্তু বঙ্কিমের এইসব উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট বা সলতে পাকানোর মনীষা তৈরি হয়েছিল এই শতাব্দীরই প্রথমার্ধ থেকে। এই সময় রামমোহন রায়, নব্যবঙ্গের দল (ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও ও মেকলে প্রধান তিন দীক্ষাগুরু) ও ডিরোজিওর অনুগামীদের মতো একাধিক আধুনিক চিন্তানায়কেরা ইংরেজি শিক্ষা ও যুক্তি দিয়ে আমাদের মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় ফাটল ধরিয়ে দেন। অন্যদিকে তাঁর কলেজের পাঠ্যতালিকায় প্রধানত ছিল নীতিশাস্ত্র, ভূগোল, গণিত এবং ইংরেজি সাহিত্য। উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজি সাহিত্যে ও দর্শনের প্রতি বিশেষ ভক্তি ছিল। কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশিষ্ট যুক্তিবাদ, বিকাশ, বলিষ্ঠতা ও বৈচিত্র্য তাকে মনে-প্রাণে আকৃষ্ট করেছিল, যা তিনি লব্ধ করেছিলেন ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র চর্চার দ্বারা; যদিও পরবর্তীকালে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচ্য দর্শনের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্টি সাহিত্যেকর্মে এই চিন্তা-চেতনার একাধিক পরিচয় পেয়ে থাকি।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও তিনি অকপটভাবে ইউরোপীয় কবি-সাহিত্যিক-ঔপন্যাসিক-ঐতিহাসিক-দার্শনিকদের নাম ও তাঁদের লেখার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। আবার কোথাও বা পরোক্ষে সে কথা স্বীকার করেছেন; তা উপন্যাসের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা অংশে হোক বা পরিশিষ্ট অংশেই হোক। যেমন 'রজনী' উপন্যাসের ভূমিকাংশে লর্ড লিটন ও উইলকি কলিন্সের কথা স্বীকার

করেছেন। আবার ইউরোপীয় উপন্যাসের 'এপিগ্রাফে'র ন্যায় 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের শুরুতে চারটি খণ্ড মিলিয়ে মোট ৩১টি পরিচ্ছেদের ১৩টি পরিচ্ছেদেই বঙ্কিমচন্দ্র শেক্সপীয়র, বায়রন, কীটস্ প্রমুখের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সতোরো বছর বয়সে ইংল্যান্ড যাত্রার সময় থেকেই তাঁর মন পশ্চিমাভিমুখী হয়ে ওঠে। তাঁর লেখা যে সমস্ত গল্প ও উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে ইউরোপ প্রসঙ্গগুলি এসেছে, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল— 'প্রায়শ্চিত্ত'(১৮৯৪), 'নষ্টনীড়'(১৩০৮), 'বলাই'(১৩৩৫), 'রবিবার'(১৩৩৬), 'রাজটিকা' (১৮৯৮), 'শেষকথা'(১৩৪৬), 'ধ্বংস'(১৯৪১), 'গোরা'(১৯১০) 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) প্রভৃতি।

স্বর্ণকুমারী দেবীর অনেক উপন্যাসে বিলাতি শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার কথা বহুবিধ প্রসঙ্গে উঠে এসেছে। তাঁর 'কাহাকে'(১৯৯৮) উপন্যাসে সমকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষিত উচ্চবিত্ত সমাজের একটি নিপুণ ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসটির মধ্যে আমরা ঈঙ্গবঙ্গ সমাজের সামাজিক মেলামেশার চিত্র, ইংরেজ শিক্ষাগর্বিত বাঙালি সমাজের আদব-কায়দা ইত্যাদির পরিচয় পেয়ে থাকি।

তৃতীয় অধ্যায়:

রবীন্দ্র সমসাময়িক বাংলা কথাসাহিত্য

অনুবাদের আস্বাদনে ইউরোপ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে থেকে 'প্রদীপ', 'সাহিত্য', 'দাসী', 'সখা', 'মুকুল' ইত্যাদি পত্রিকায় আমরা অনুবাদমূলক গল্পের সন্ধান পেয়ে থাকি। বিশেষ করে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকা এক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই পত্রিকাটিতে অনেক বিদেশি গল্প অনুবাদের পাশাপাশি বিদেশি লেখকদের নিয়েও নানা আলোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময়েই 'দাসী' (১৮৯৫) পত্রিকায় কন্টিনেন্টাল সাহিত্যিক টলস্টয়ের 'জীবনোপায়' গল্পটি অনুবাদ করেন অপূর্বচন্দ্র দত্ত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ফরাসি-প্রসূন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে। এর মধ্যে তিনি দোরিয়াক, মরে, গাবোরিয়ো, জোলা, মার্ক, শার্ল-গোলে, আলফঁস দোদে, দুমা, বালজাক, মোপাসাঁ প্রভৃতি

লেখকদের গল্পের অনুবাদ করেছেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখি, টলস্টয়ের গল্পগুলি একাধিকবার অনূদিত হতে থাকে। চারুচন্দ্র গুহর 'টলস্টয়ের গল্প' (১৯১৯), দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়ের 'সপ্তর্ষি' (১৯২৩), শিশিরকুমার মিত্রের 'লোভের উৎপত্তি' (১৯২৩), 'বোকা আইভান' (১৯২৪) ইত্যাদি গল্প তাদের মধ্যে অন্যতম।

চতুর্থ অধ্যায়:
কল্লোলযুগের বাংলা কথাসাহিত্য
মনস্তাত্ত্বিকতায় ইউরোপ

কল্লোল পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩০ বঙ্গাব্দের প্রথম দিনে। এইসময় ভারত ও ইউরোপীয় জন-জীবন নৈরাশ্য, নৈরাজ্য ও অনিশ্চয়তায় ডুবে যায়। আর তার প্রভাব বাংলা তথা ভারত-ভূমিতে আছড়ে পড়েছিল। ১৯১৪ - ১৯১৮ সালের সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষের জীবন-চিন্তা ও নৈতিকতায় আসে প্রবল অনিশ্চয়তা। এই সময়ে মার্কসবাদ, ফ্রয়েড-এর মনস্তত্ত্ববাদ ও আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের প্রভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন ঘটে। ফলে একদিকে রুশ বিপ্লবের সফলতা, অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী শূন্যতা ও হতাশার পটভূমি— এই দুইয়ের মধ্যে দোলায়িত হতে থাকে ইউরোপ। মানুষ সেদিন ইতি থেকে নেতিতে, স্থির থেকে গতির দিকে, একের পরিবর্তে একাধিক বিকল্প খুঁজতে থাকে। ঠিক এই অবস্থায় বাংলার কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা আবির্ভূত হয়েছিলেন।

আমরা কল্লোল গোষ্ঠীর বিভিন্ন লেখকদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসুর কথাসাহিত্য নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে কোন কোন ইংরেজ কথাসাহিত্যিকের চিন্তাধারায় সংশয়, অবক্ষয়, দেহচেতনা ও ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব তাঁদের গল্প-উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়, এঁদের প্রতিও বাংলার তরুণ লেখকদল আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ডি এইচ লরেন্স ও অলডাস হাক্সলি। অলডাস হাক্সলি যুদ্ধোত্তর জীবনের কৃত্রিম বন্ধ্যারূপ, বুদ্ধিজীবীদের জীবনের অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও স্ববিরোধিতাকে তাঁদের গল্প উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। ইংরেজি

কথাসাহিত্যের জেম্‌স জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌, ডরোথি রিচার্ডসনের ব্যবহৃত Stream of consciousness-এর প্রভাব অনেক বাঙালি লেখকের লেখায় পড়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়:
প্রমথ চৌধুরী ও প্রভাতকুমার

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ইউরোপ

বাংলা ছোটগল্পের পথচলার পথে রবীন্দ্রনাথের পরেই যাঁর নাম আমাদের কাছে উঠে আসে তিনি হলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)। প্রভাতকুমার কতগুলি ইউরোপীয় পটভূমিতে গল্প লিখেছেন সেইগল্পগুলির প্রধান চরিত্র ইংরেজ কিংবা বিদেশিনী। বিদেশি পটভূমিকায় রচিত তাঁর এই গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকে যেমন বিস্তৃতি প্রদান করেছে, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের পরিচয় করে দিয়েছে বিদেশি জীবনযাত্রা ও বিদেশি চরিত্রদের সঙ্গে। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নবকথা'র 'বেনামী চিঠি' (ভাদ্র, ১৩০৫, প্রদীপ) গল্পের মধ্যে দিয়েই তার শুভ সূচনা হয়েছে বলা যায়। পরবর্তীকালে 'ছদ্মনাম', 'মুক্তি', 'ফুলের মূল্য', 'পুনর্মূষিক', 'প্রবাসিনী' 'বিলেতফেরতের বিপদ', 'মাতৃহীন', 'লেডি ডাক্তার', 'কুমুদের বন্ধু', 'কুকুর ছানা', 'বিলাতী রোহিনী' ও 'সতী' প্রভৃতি গল্পগুলি ইউরোপের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। গল্পগুলিতে স্বাদের ভিন্নতার কারণ পরিবেশের বৈচিত্র্য এবং চরিত্রের বৈচিত্র্য।

ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে পারদর্শী বিলাতফেরত ব্যারিস্টার প্রমথ চৌধুরী সমাজের কাছে 'চৌধুরী সাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন। এই 'চৌধুরী সাহেবে'র পক্ষে বাংলা সাহিত্যচর্চা এক আশ্চর্য ঘটনা বলা চলে। প্রমথ চৌধুরীর প্রথম অনূদিত গল্প 'ফুলদানি' সাহিত্য পত্রিকায় ১২৯৮ সালে এবং প্রথম মৌলিক গল্প 'প্রবাস স্মৃতি' প্রকাশিত হয় ভারতী পত্রিকায় ১৩০৫ সালে। তবে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সাধনায় বিশেষ করে, গল্প রচনায় সার্থকতার মূলে আছে 'সবুজ পত্র' (১৯১৪-১৯২৭) পত্রিকা। 'সবুজপত্র' পত্রিকাটি প্রকাশের পূর্বে তিনি তেমন কোনও মৌলিক গল্প রচনা না করলেও এর দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই বেশকিছু গল্প প্রকাশ করতে শুরু করেন। ফলে পাঠকের হাতে এসে পৌঁছাতে শুরু করে একে একে 'চার-ইয়ারী কথা' (১৯১৬), 'আহুতি' (১৯১৯), 'নীললোহিত' (১৯৩২), 'নীল-লোহিতের আদি প্রেম', 'ঘোষালের ত্রিকথা' (১৯৩৭) ও 'আশুকথা'র (১৯৩৯) মতো একাধিক শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি।

এছাড়াও আমরা পরবর্তীকালে প্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর ‘গল্প-সংগ্রহ’ গ্রন্থ পেয়ে থাকি। এখানেও প্রায় ৩৮টি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের গল্প সংকলিত হয়েছে। এইসব গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর ইউরোপ সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে ‘ফুলদানী’, ‘প্রবাসস্মৃতি’, ‘চার-ইয়ারী কথা’, ‘প্রিন্স’, ‘মেরি ক্রিসমাস্’, ‘ধ্বংসপুরী’, ‘অদৃষ্ট’, ‘ঝাঁপান খেলা’, ‘বীরপুরুষের লাঞ্ছনা’, ‘গল্পলেখা’, ভূতের গল্প’, ‘ভাববার কথা’, ‘পূজার বলি’ ইত্যাদি গল্পে।

ষষ্ঠ অধ্যায়:

ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরাম

ব্যঙ্গ-কৌতুকে ইউরোপ

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিলাতের শিল্প-প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর কর্মজীবনে বিলাত যাত্রা করেন। তখন তিনি কলকাতা মিউজিয়ামের সহকারি কিউরেটর পদে ছিলেন। সরকারি কর্মজীবন থেকে অবসরের কয়েক বছর পরে তিনি রচনা করেন ‘কঙ্কাবতী’ (১৮৯২) উপন্যাস। এই উপন্যাসের ভৌতিক চরিত্র স্কল ও স্কেলিটনকে অবলম্বন করে লেখক ব্যঙ্গের কষাঘাত করেছেন ইংরেজের অনুকরণপ্রিয় দেশের এক শ্রেণীর মানুষকে, যারা নকল সাহেবিয়ানাকে মনে করেন তাদের সামাজিক মর্যাদার সূচক। স্কল ও স্কেলিটনের মাধ্যমে এদেশের একশ্রেণীর ইঙ্গভাবাপন্ন মানুষের ইংরেজি কেতাদুরস্থ প্রথাপ্রীতিকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করতে গিয়ে লেখক ঔপনিবেশিক যুগের পুরুষকার অলজ্জ মানসিকতা এবং নিজেদের যুক্তি-বিচারবুদ্ধি ও মর্যাদায় অবিশ্বাস্য ও অশ্রদ্ধাকে ব্যঙ্গের উপকরণ হিসেবে নিয়েছেন লেখক।

পরশুরামের প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘গড্ডলিকা’র প্রকাশ ১৯২২ সালে। এর সমসাময়িক পূর্বে একাধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৯), রুশ বিপ্লব (১৯১৭), বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ইত্যাদি ঘটনা। এর ফলে একদিকে দেশীয় রাজনীতির টানাপোড়েন, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে কবলিত ভারতবাসীর দারিদ্র, বেকারত্ব ভারতবর্ষকে এক গভীর সংকটের মুখে ফেলেছিল। এই সময় সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল এক শ্রেণির মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। ব্যাবসা, ধর্ম, প্রেম, দাম্পত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি মানুষের সর্বপ্রকার ভণ্ডামি, ভাববিলাসিতা ইত্যাদিকে পরশুরাম ব্যঙ্গ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সামাজিক অশান্তি ও অবক্ষয়, দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ, স্বাধীনতালাভ

ও তার অব্যবহিতপরে ও শান্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি একাধিক গল্প রচনা করেছেন। পরশুরামের লেখা গল্প সংখ্যা একশ আটটি এবং গল্পগ্রন্থ সংখ্যা ন'টি। গল্পগ্রন্থগুলি হল— "গড্ডলিকা", "ধুস্তরীমায়া ইত্যাদি গল্প", "গল্পকল্প", "কজ্জলী", "আনন্দবাঈ ইত্যাদি গল্প", "চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প", "হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প", "নীলতারা ইত্যাদি গল্প", "কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প"।

সপ্তম অধ্যায়:

দিলীপকুমার রায়

দিলীপকুমার রায় এই ইউরোপীয় জীবন অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে বেশকিছু উপন্যাস লিখেছেন— এগুলি হল 'মনের পরশ' (১৯২৬), 'বহুবল্লভ' (১৯৩৫), 'দোলা' (১৯৩৫-৩৬), 'দু-ধারা' (১৯৩৫), 'তরঙ্গ রোধিবে কে?' (১৯৩৮)। এই উপন্যাসগুলিতে তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শ আমাদের মনেকে কীভাবে সাড়া দেয় সেটাই খানিকটা বাস্তব ও খানিকটা কল্পনার ওপর ভিত্তি করে দেখিয়েছেন। এঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ার জন্য অনেকে বিলাতে যাওয়ার কথা ভেবে থাকলেও ব্যারিস্টারি পড়াই ছিল প্রধান। ব্যারিস্টারি পড়া সেকালের সম্ভ্রমের বিষয় ছিল। সেকালে বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়া যে কতটা মোহ ছিল তা তাঁর একাধিক উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর কথায় স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, আর তা সে ওকালতি ব্যাবসা করুক বা না করুক।

অষ্টম অধ্যায়:

অন্নদাশঙ্কর রায়

অন্নদাশঙ্কর ইউরোপীয় পটভূমিকায় একাধিক উপন্যাস লিখেছেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— i. আগুন নিয়ে খেলা (১৯৩০), ii. সত্যাসত্য, (১৯৩২-৪২) iii. পুতুল নিয়ে খেলা (১৯৩৩) প্রভৃতি। এইসবের মধ্যে 'সত্যাসত্য' ছয়টি খণ্ডে সমাপ্ত একটি মহাকাব্যোচিত উপন্যাস। উপন্যাসের প্রথম খণ্ড 'যার যেথা দেশ' (১৯৩২)-এর ভূমিকায় লেখক উপন্যাসের সৃষ্টির প্রেরণা, উদ্দেশ্য এবং সামগ্রিক উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও চরিত্র বিশ্লেষণে সামগ্রিক আলোচনা করেছেন।

উপসংহার

সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে বাংলা কথাসাহিত্যে ইউরোপীয় প্রভাবের ধরণ ধারণও। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে বাঙালির মানসপটে যে পরিবর্তন শুরু হয় তা পূর্ণতা পায় বিশ শতকের প্রথমদিকে বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে। উনিশ শতকের প্রচলিত মূল্যবোধ ও বিশ শতকের সংশয়, সন্দেহ, জীবন জিজ্ঞাসা ও যুক্তির দাবি ইত্যাদি বাঙালির মন ও মানসিকতায় প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্র বিরোধী হলেও শতাব্দীর শেষ নাগাদ সমাজের চোখে তা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিলাত যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ বিলেতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিলেত তথা ইউরোপ আর সাত সমুদ্রের দূরত্ব বলে মনে হয়নি। কারণ সেখানে বাঙালি গিয়ে পড়াশুনা ও চাকরির পাশাপাশি বিভিন্ন জীবিকার্জনের জন্য নিয়মিত যাতায়ত করছে।

অন্যদিকে, এই সময়ে বিশ্বযুদ্ধের নানা পরোক্ষ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ভারতভূমিতে পড়ে কারণ ভারত তখন ব্রিটিশ শাসিত উপনিবেশ। ফলে ইউরোপীয় রাজনীতি ও বিশ্বযুদ্ধ বাঙালির রাজনৈতিক জীবনে কালান্তরের আভাস বয়ে আনে। ইউরোপীয় রাজনীতি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং অব্যবহিত পরে রুশ বিপ্লবের ফলে ইউরোপের বুর্জোয়া সমাজের ভিত টলে যায় ও অর্থনীতিতে প্রবল চাপ পরে। এই অর্থনীতি কাঠামোর সঙ্গে সেখানকার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হওয়ায় মানুষের মনে দেখা দেয় সংশয়, হতাশা, দোলাচলতা। এই দোলাচলতার মধ্যে থেকে লড়াই চলতে থাকে, সারাজীবনে ভিতরে ও বাইরে। অনেক গল্প-উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যেও আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যর্থতা, হতাশা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ছাপ প্রত্যক্ষ করি।

তত্ত্বাবধায়ক সহ-তত্ত্বাবধায়ক গবেষক